জল পড়ে পাতা নড়ে

‘তোমার বেতন দুইশো বারো’

মুহম্মদ জুবায়ের

‘ঠোলা’ শব্দটি কোত্থেকে এলো? রাজশেখর বসুর চলন্তিকা এবং বাংলা একাডেমির অভিধানে দেখছি এই শব্দটি নেই। না থাক, ‘ঠোলা’ বললে আমরা পুলিশকেই বুঝি। স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ার সময় শব্দটি প্রথম শুনেছিলাম। আমাদের শহরে স্থানীয় ভাষার বিশেষ ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিটি যুক্ত করে বলা হতো ‘ঠোল্লা’। ইংল্যান্ড-আমেরিকার মতো দেশেও পুলিশকে ‘কপ’ বলা হয়, যদিও ‘ঠোলা’-র মতো অতোটা তুচ্ছার্থে নয়। আমাদের দেশে ষাটের দশকে বিভিন্ন আন্দোলনের কালে দলনকারী পুলিশদের নিয়ে একটি শ্লোগান ছিলো – ‘পুলিশ তুমি যতোই মারো, তোমার বেতন দুইশো বারো’। পশ্চিমবঙ্গের এক বন্ধুর কাছে শুনেছি, সেখানে তা আরো কিছু কম করে বলা হতো, একশো বারো।

একাত্তরে রাজারবাগ প্রতিরোধ যুদ্ধের পরে পুলিশের কোনো সুকীর্তি খুঁজতে গেলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হবে। বাল্যকাল থেকে দেখে আসছি, পুলিশরা প্রায়শই খবরের কাগজের শিরোনাম হয়ে আসে এবং তা প্রায়শই সদর্থে নয়। তাদের কীর্তিকাহিনীর অন্ত নেই। সরকারের বিরোধী পক্ষকে যথেচ্ছ ঠ্যাঙানো তাদের নিয়মিত কর্মের অন্তর্গত, যেন তা প্রেসক্রিপশনের ওষুধ – দিনে তিনবার আহারের পরে সেব্য। শক্তিবর্ধক টনিক সেবনের মতো মাঝেমধ্যে সাংবাদিক-পীড়ন। শামসুননাহার হল-কাণ্ড থেকে শুরু করে অতিসাম্প্রতিক কানসাট-কাণ্ড ও ক্রিকেটমাঠ-কাণ্ড রীতিমতো ব্যতিক্রমী, এমনকি অমর কীর্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। এতোসব ঘটনা নিয়মিত ঘটানোর পটুত্ব দেখে মনে হয়, এরা কি আমাদের দেশের মানুষ, আমাদেরই মতো হাত দিয়ে ভাত খায়?

পুলিশকে সর্বপ্রকার অপরাধীদের অর্থাৎ সমাজের কালো দিক নিয়ে কাজ করতে হয়। পুলিশের কাছে মানুষ যায় দুঃসংবাদ নিয়ে। ‘চাকরিতে আমার প্রমোশন হয়েছে’ এই ধরনের সুসংবাদ নিয়ে মিষ্টির ভাণ্ডসহ কেউ থানায় যায় না, যায় বিপদগ্রস্ত ও বিপন্ন হয়ে। পেশাটি দুরূহ বটে। দুই দিকে দুই ধরনের মানুষ – একপাশে বিপন্নরা, অন্যদিকে অপরাধজগত। বিশাল স্নায়বিক চাপের কারণে তাদের পক্ষে আর দশজনের মতো আচরণ করা কঠিন। কিন্তু নিরীহ মানুষকে পীড়ন করার সুযোগও তাদের নেই। দুর্বৃত্তদের অপকর্ম থেকে নাগরিকদের রক্ষা করা ও নিরাপত্তা দেওয়ার শর্তেই তারা পুলিশ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত।

অথচ বাস্তবে বাংলাদেশে আমরা যা পাচ্ছি তাকে অনেকে পোশাকধারীদের সংগঠিত সন্ত্রাস বলেন। এমনও বলতে শুনি, বাংলাদেশে সবচেয়ে সংগঠিত দুর্বৃত্ত বাহিনীর নাম পুলিশ। বিপদগ্রস্ত হয়ে কেউ আর আজ পুলিশের কাছে নালিশ জানাতে যেতে সাহস করে না, যদি না তার পকেটভর্তি টাকা অথবা নেপথ্যে কোনো প্রভাবশালীর সমর্থন থাকে। রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনযাপনকে দুরূহতর ও বিপন্ন করা এখন পুলিশের দায়িত্ব, এমন মনে করার হাজারটা কারণ আছে। কীসের দায়িত্ব, কীসের কর্তব্য ও ন্যায়বোধ, ঘাটে ঘাটে তারা টাকা চায়, টাকায় সন্তুষ্ট না হলে তাদের দিয়ে কোনো কাজই করানো সম্ভব নয়, আমরা সবাই জানি। টাকার জোর না থাকলে অতি সৎ ও নিরীহ মানুষকেও তারা বিপদগ্রস্ত করতে যে পারঙ্গম, তা-ও বাস্তব। হয়তো আক্ষরিক অর্থে দুইশো বারো পুলিশের বেতন নয়, কিন্তু তার পরিমাণ যা-ই হোক

না কেন, অন্যায়ভাবে অর্জিত না হলে কোনো কোনো পুলিশ কর্মকর্তার পক্ষে টাকার পাহাড় বানিয়ে ফেলা সম্ভব হতো না। ‘দুইশো বারো’ এখন হয়তো হয়েছে ‘লক্ষ বারো’, যদিও তা বেতনের অংক নয়, তাকে অর্জিতও বলা যায় না। লুণ্ঠন হয়তো সবচেয়ে উপযুক্ত শব্দ।

আমেরিকা ও সিঙ্গাপুরে বসবাসের অভিজ্ঞতায় জানি, সেসব দেশে সাধারণভাবে পুলিশের ওপর মানুষ ভরসা রাখে। সত্য বটে, সেখানেও পুলিশ অমানবিক ও ন্যায়বর্জিত আচরণ করে। আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস-এ রডনি কিং-কে নির্মমভাবে পেটানো বা সম্প্রতি নিউ অরলীয়েন্স শহরে বৃদ্ধ এক অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষককে বিনা কারণে প্রকাশ্যে নির্যাতন করার মতো ঘটনা তারাও ঘটায়। কাটরিনা-বিপর্যয়ের পর নিউ অরলীয়েন্স-এ মানুষের পরিত্যক্ত বাড়িঘর লুটপাটে পুলিশের জড়িত থাকাও প্রমাণিত। তারপরেও স্বীকার করতেই হবে, এগুলি ব্যতিক্রম, প্রতিদিনের ঘটনা নয়। বিপন্ন ও বিপদগ্রস্ত নাগরিক প্রথমে পুলিশের কথাই ভাবে সম্ভাব্য রক্ষক হিসেবে। মনুষ্যসমাজের পক্ষে, তা যে দেশেই হোক না কেন, সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত ও সুবিচারসম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু সভ্য দেশে নালিশ নিয়ে পুলিশের কাছে গেলে অভিযোগটি শোনা বা লিপিবদ্ধ করা হবে না, তা অসম্ভব। পুলিশের কাছে যাওয়ার আগে ভাবতে হবে না আমি কোন প্রভাবশালীকে চিনি বা আমার পরিচয় কি অথবা কতো টাকায় আমি উদ্ধার পাবো। সেখানে পুলিশের সহায়তা পাওয়া গণতান্ত্রিক অধিকার, রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকে। বাংলাদেশে সেদিকে কারো ভ্রুক্ষেপ আছে বলে বিশ্বাস করার কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না।

মনে আছে, বছর বিশেক আগে ঢাকায় একদিন সস্ত্রীক রিকশায় উঠেছি। কী কথায় পুলিশের ঘুষ খাওয়ার কথা উঠলে আমি বলি, পুলিশ তো বাঘমার্কা সিকিও ঘুষ নেয় (বাঘমার্কা সিকি তখন খুবই চালু মুদ্রা, এখন বোধহয় তা বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্ট ও জাদুঘর ছাড়া কোথাও পাওয়া যাবে না)। আমার স্ত্রীর কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। অগত্যা সাক্ষী মানতে হয় রিকশাচালককে। তার বয়ান : ‘সিকি কি কন স্যার, আমার কাছে কমলার একখান কোয়া ঘুষ নিছে পুলিশ। লগে একখান থাপ্পড় অবশ্য দিছিলো।’

কিশোর বয়সীদের জন্যে লেখা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস পড়েছিলাম, সেখানে বয়স্কা এক মহিলা ডাক ছেড়ে বলছেন, ‘এখন কী হবে রে, বাড়িতে পুলিশ পড়েছে, ডাকাতদের খবর দে কেউ!’

বাংলাদেশে পরিস্থিতি খানিকটা সেরকমই বটে। পুলিশের চেয়ে পেশাদার দুর্বৃত্তরা অনেক সহনীয়। হাটে-মাঠে-ঘাটে-বনেজঙ্গলে-জলেস্থলে সর্বত্র চাঁদাবাজদের উপদ্রব মানুষ সহ্য করে হয়তো খানিকটা এরকম যুক্তিতেই। ঘুষখোর হিসেবে পুলিশের সুনাম ও দক্ষতা যুগ-যুগান্তরের। মিছিলে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ (ইদানিং গরম পানি ছিটানো এবং রাবার বুলেট নিক্ষেপ – এই দুই বস্তু আগে ছিলো না) এবং গুলিবর্ষণেও তাদের উৎসাহ ও দক্ষতা প্রশ্নাতীত। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জোচ্চোর, প্রতারক, ধর্ষক, ডাকাত, ছিনতাইকারী, উৎপীড়নকারী, নারীনির্যাতক, অপহরণকারী এইসব গুণপনার পরিচয়।

এ কথাও মানতে হবে, পুলিশ বাহিনীতে এখনো সৎ ও হৃদয়বান মানুষ আছেন। থাকতেই হবে, না থাকা সম্ভব নয়। আমি নিজে দেখেছি একজন পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তার বাড়িতে প্রতিদিন বাজারের টাকার হিসেব করতে হয়, মাছ-মাংসের বিলাসিতা সপ্তাহে এক-আধদিন। ভদ্রলোক রাজশাহীতে কর্মরত ছিলেন আশির দশকের মাঝামাঝি। দুঃখের বিষয়, এই ধরনের মানুষরা আজ বিরল প্রজাতিভুক্ত। তবে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যে যাননি, সেটিই হয়তো আশার কথা।

email : mz1971@gmail.com